মূলপাতা

মরীচিকা

Asif Adnan

January 30, 2019

10 MIN READ

১.

পৃথিবীতে দুটো ধর্মের অনুসারীরা ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)- কে মসীহ বা মেসায়াহ হিসেবে মানে। ইসলাম ও ক্রিশ্চিয়ানিটি। এ দুটো ধর্মের অনুসারীরাই বিশ্বাস করে যে শেষ যুগে ঈসা (আলাইহিস সালাম) ফিরে আসবেন। তাঁর জীবন, কর্ম ও পরিবারের অনেক ডিটেইলের ব্যাপার এ দুটো ধর্মের অনুসারীরা একমত, অথবা তাদের অবস্থান খুবই কাছাকাছি। বর্তমানে পৃথিবীতে যতো মানুষ আছে, ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) এর ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান এ দুই ধর্মের মানুষের। কিন্তু এতো সাদৃশ্য সত্তেও যদি কোন খ্রিস্টান আপনাকে প্রশ্ন করে 'তুমি কি মসীহকে স্বীকার করো? Do you accept Jesus?' একজন মুসলিম হিসেবে আপনি 'হ্যা' বলতে পারবেন না। কারন যীশুকে স্বীকার করা, মেনে নেয়া বলতে একজন খ্রিস্টান বোঝায় তাঁকে তিনের (ট্রিনিটির) এক বলে স্বীকার করা। তাঁকে 'ঈশ্বরের পুত্র' হিসেবে মেনে নেয়া, যীশুকে মেনে নেয়ার মাধ্যমেই ব্যাক্তির পরকালের ফয়সালা হবে এটা মেনে নেয়া – ইত্যাদি।

একজন মুসলিম কখনোই এগুলো স্বীকার করবে না, কারন এগুলো স্পষ্ট কুফর এবং শিরক। বিশ্বাসের যে কাঠামো থেকে খ্রিস্টানরা তাঁকে মানছে তাঁর ভিত্তি হল কুফর এবং শিরক। অন্যদিকে যে কাঠামো থেকে মুসলিমরা তাঁকে নবী এবং মসীহ হিসেবে মানছে তাঁর ভিত্তি হল ইমান ও তাওহিদ। যদিও ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) এর ব্যাপারে অনেক কিছুতে মুসলিম এবং খ্রিস্টানরা একমত কিন্তু এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের কারণে ব্যাক্তি ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) এর ব্যাপারে মুসলিম ও খ্রিস্টানরা একে অপরের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করছে। মুসলিমদের দৃষ্টিতে খ্রিস্টানরা কাফির এবং শিরকে লিপ্ত, অন্যদিকে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী মুসলিমরা অবিশ্বাসী। এতো মিল থাকার পরও বিশ্বাসের কাঠামো এবং প্রাথমিক মূলনীতিতে পার্থক্যের কারনে দুটো বিশ্বাস পরস্পর সাংঘর্ষিক হচ্ছে।

পরের আলোচনার বিশ্বাসের কাঠামো এবং প্রাথমিক মূলনীতিগত পার্থক্যের এ গুরুত্বের ব্যাপারটা আমাদের কাজে লাগবে।

২.

ব্যাক্তি স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার, নারী অধিকার, সাম্য, সম্প্রীতি, প্রগতি, উন্নতিসহ বেশ কিছু ধারণা আছে যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে বর্তমান সময়ের অধিকাংশ সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনগুলো গড়ে উঠেছে। জাতিসঙ্ঘ যখন সমকামীতাকে বৈধতা দেয়ার পক্ষে পলিসি বানায় কিংবা মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে শাইখ আহমাদ শফির বক্তব্যকে যখন উন্নয়নবিরোধী বা পশ্চাৎপদ বলা হয় তখন সেটা করা হয় এ ধারনাগুলোর ওপর গড়ে ওঠা চিন্তার কাঠামো থেকে। এ ধারণাগুলোকে স্বীকার না করাকে বর্বরতা, অসভ্যতা, অজ্ঞানতা কিংবা পশ্চাৎপদতা বলা হয়, এবং বারবার এগুলোকে ব্যবহার করে ইসলাম ও মুসলিমদের সমালোচনা করা হয়। অন্যদিকে মুসলিমদের মধ্যে অনেকে বলেন যে এ ধারণাগুলো ইসলামেও আছে, তবে ইসলাম এগুলোর ওপর নির্দিষ্ট কিছু বিধিবিধান যোগ করে।

কিন্তু ইসলামের অবস্থান থেকে এ ধারণাগুলো এবং এগুলোর উপসংহার হিসেবে পাওয়া পলিসিগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমাদের বুঝতে হবে এ শব্দগুলো, টার্মিনোলজিগুলো আসলে কোন অর্থ ও মতাদর্শ ধারন করে। বাহ্যিক সাদৃশ্যের হিসেব কষতে বসার আগে, পরিভাষার শাব্দিক অগভীর পর্যায় থেকে সরে এসে আমাদের তাকাতে হবে এ ধারনাগুলোর পেছনের ফার্স্ট প্রিন্সিপালস বা প্রাথমিক মূলনীতিগুলোর দিকে।

প্রথমে আমাদের একটা প্রশ্ন করতে শিখতে হবে –

পাশ্চাত্য যখন মানবাধিকার, নারী অধিকার, ব্যাক্তি স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা কিংবা এরকম অন্য কোন 'অধিকার' এর কথা বলে তখন 'অধিকার' বলতে তারা কী বোঝায়? এ ধারণাগুলোকে তারা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করছে?

আমরা যদি এ প্রশ্নটা করতে পারি এবং আন্তরিকতা, সততা ও অধ্যাবসায়ের সাথে এর উত্তর খুঁজি তাহলে আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে কেন মুসলিম হিসেবে আমরা এই ধারনাগুলো প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য। এ প্রতিটি পরিভাষা, প্রতিটি ধারণার শাব্দিক যে অর্থ আমরা ধরে নেই তার বাইরেও এগুলোর সুনির্দিষ্ট মতাদর্শিক অর্থ আছে। এবং সেক্যুলার পশ্চিম এ শব্দগুলো ব্যবহার করার সময় সুনির্দিষ্ট মতাদর্শিক অর্থেই ব্যবহার করে, শাব্দিক অর্থে না। চিন্তা ও বিশ্বাসের একটা নির্দিষ্ট কাঠামো থেকে এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। ঠিক যেমন, আমরা মুসলিমরা যখন 'সালাত' বলি তখন সাধারণত আমরা শাব্দিক অর্থ বোঝাই না। শরীয়াহর কাঠামোর ভেতরে সালাত এর যে সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে, সেটাকে বোঝাই।

পশ্চিমের এ ধারনাগুলোর ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। এ শব্দ ও কনসেপ্টগুলোকে তারা এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিক কাঠামো ভেতরে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করে। একটি লিবারেল দার্শনিক ফ্রেইমওয়ার্কের ভেতর থেকে এ শব্দগুলোকে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ দেয়া যাক।

আমরা যেগুলোকে 'সোশ্যাল সায়েন্সেস' বা সামাজিক বিজ্ঞান বলি সেগুলোর আলোচনার বিষয়বস্তু কী? 'মোটাদাগে ব্যাক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র' – আপাতভাবে বলে দেয়া যায়। কিন্তু আপনি যদি সত্যিকারভাবে জানার এবং বোঝার চেষ্টা করেন, বাইরের খোলস সরিয়ে শেকড়ের দিকে তাকান - তাহলে দেখবেন সামাজিক এ বিজ্ঞানগুলো ব্যাক্তির একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করে। ব্যাক্তির এ সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে তারা 'অধিকারের' সংজ্ঞা দেয়। সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের আলোচনায় যায়।

এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিক কাঠামোর ফসল হিসেবে বেরিয়ে আসা এ সংজ্ঞায় এক নির্দিষ্ট চিন্তার, বিশেষ ধরণের মানুষের কথা বলা হয়। এমন কেউ যে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী মনে করে। যে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে ধরে নেয় (freedom as self-evident value)।

ইম্যানুয়েল কান্টের মতে, ব্যাক্তি অন্য কারো ঠিক করে দেয়া ভালোমন্দের মাপকাঠি মেনে নিতে বাধ্য না। ব্যাক্তি বাধ্য না কোন উচ্চতর শক্তির ঠিক করে দেয়া নৈতিকতা মেনে চলতে। নিজের ইচ্ছেমতো ভালোমন্দ নির্ধারনের এ ক্ষমতাই ব্যাক্তির এনলাইটেনমেন্টের (আলোকিত হওয়া, জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া) বৈশিষ্ট্য[1]। জীবনে কী করা উচিৎ, কী করা উচিৎ না – এপ্রশ্নগুলোর উত্তর ঠিক করবে ব্যাক্তি নিজে, এটা তার একচ্ছত্র অধিকার। অন্য কোন কর্তৃপক্ষের এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার অধিকার আছে বলে স্বাধীন ব্যক্তি স্বীকার করে না। অর্থাৎ নিজ কল্যাণের প্রশ্নে শ্রেষ্ঠ বিচারক ব্যাক্তি নিজেই। এ অর্থেই ব্যক্তি স্বাধীন, স্বশাসিত (autonomous)[2]।

এ দর্শন অনুযায়ী সর্বোচ্চ স্বার্থ অর্জিত হয় সর্বোচ্চ ব্যাক্তি স্বাধীনতার মাধ্যমে। অর্থাৎ আমার জন্য কোনটা ঠিক সেটা আমিই ঠিক করবো এবং আমার স্বার্থ নির্ভর করে ইচ্ছেমতো যেকোন কিছু করার সক্ষমতা ও স্বাধীনতার ওপর। এবং কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে 'কী বেছে নেয়া হচ্ছে' তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল "যেকোন কিছু বেছে নেয়ার স্বাধীনতা ও সক্ষমতা" থাকা। ব্যাক্তি স্বার্থ ও ব্যাক্তি স্বাধীনতার এ সম্পর্কেনিয়ে অমর্ত্য সেন সাম্প্রতিক সময়ে বিস্তারিত আলোচনা এনেছেন[3]।

যতো সামাজিক বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ধারণা ও প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্য থেকে আসছে সেগুলো গড়ে উঠেছে ব্যাক্তির এই নির্দিষ্ট সংজ্ঞা এবং এর অন্তর্নিহিত মূলনীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে। এগুলোর উদ্দেশ্য? এই নির্দিষ্ট ব্যাক্তি বা Human Being এর জন্য উপযুক্ত বাজার, সমাজ, কাঠামো ও সরকার গড়ে তোলা। যেমন অর্থনীতির উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিকভাবে ব্যক্তির উন্নতির ক্ষেত্র ও সুযোগগুলোকে সহজ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, কাঠামো, সমাজ ও নেতৃত্ব প্রস্তুত করা।

যদি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কল্যানের ব্যাপারে নিজেই সবচেয়ে ভালো জানে এবং নিজ স্বার্থসিদ্ধিই যদি সামাজিক কল্যাণের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হয়, তাহলে কোনো রাষ্ট্র, মাওলানা, চার্চ, কারোই অধিকার নেই ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনে বাঁধা দেয়ার। কারন নিজ স্বার্থ অর্জনই প্রত্যেকে কাজের বৈধতার মানদন্ড। অ্যামেরিকান নিও ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ জন বেইটস ক্লার্কএর ভাষায়,

"একজন ব্যাক্তির লোভকে অপরের লোভের ওপর যথাযথ প্রতিরোধক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এবং সার্বজনীন লোভ (universal greed) সকলের জন্য সর্বোচ্চ পরিমান কল্যান অর্জন করতে পারে। প্রথমে আপনার হাত সরিয়ে নিন, তারপর রাষ্ট্র, গির্জা ইত্যাদিরও এবং স্বার্থপরতাকে তার নিখুঁত কাজ করতে দিন।"[4]

উপযোগবাদের (utilitarianism) এর আধুনিক দর্শনের জনক জেরেমি বেন্থাম যেমন বলেছে,

"প্রকৃতি মানবজাতিকে ২টি সার্বভৌম মালিকের অধীনস্ত করেছে, কষ্ট ও আনন্দ। আমাদের কী করা উচিৎ, এবং আমরা কী করবো এটা নির্ধারনের কাজ কেবল এ দুজনেরই।"[5]

এখন ইসলামের অবস্থানের সাথে তুলনা করলে এটা বোঝা একেবারেই সোজা যে ব্যাক্তি, স্বাধীনতা, অধিকার ইত্যাদির ব্যাপারে এই ধারনাগুলো একেবারেই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। ইন ফ্যাক্ট স্বাধীনতা ও স্বশাসিত হবার যে সংজ্ঞা আমরা এনলাইটেনমেন্টের ফ্রেইমওয়ার্কথেকে পাচ্ছি সেটা স্পষ্ট শিরক। যেমন আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল বলেন,

> তুমি কি তাকে দেখনি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে? তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বুঝে? তারা কেবল পশুদের মতো; বরং তারা আরো অধিক পথভ্রষ্ট। (তর্জমা, আল ফুরক্বান, ৪৩-৪৪)

মুসলিম হিসেবে আমরা যখন শরীয়াহ দ্বারা নির্ধারিত অধিকারগুলোর কথা বলি তখন দুটো মূলনীতি আমাদের পুরো আলোচনাকে নিয়ন্ত্রন করে।

১) মানুষের প্রথম পরিচয় হল সে আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ্‌র গোলাম। সে স্বাধীন না।

২) মানবজীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র প্রতি শর্তহীন ও সম্পূর্ন আত্মসমর্পন।

কিন্তু সেক্যুলার-লিবারেল পশ্চিমের ফ্রেইমওয়ার্কএ দুটো মূলনীতিকেই অস্বীকার করে। এই ফ্রেইমওয়ার্কঅনুযায়ী মানুষ স্বনির্ভর, স্বায়ত্বশাসিত ও স্বাধীন সত্ত্বা, যার কোন স্রষ্টা কিংবা রব্বের প্রয়োজন নেই। সে উচ্চতর কোন কতৃত্বকে মানে না। এবং মানবজীবনের উদ্দেশ্য হল বিশ্বের ওপর মানুষের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। মুসলিম হিসেবে আমরা অধিকারকে বুঝি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আলোকে, আল্লাহর গোলাম হিসেবে, সেখানে পশ্চিমা চিন্তার কাঠামো মানুষের ওপর দেবত্ব আরোপ করে।

অর্থাৎ ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তার কাঠামো, বিশ্বাস ও অবস্থানের মধ্যে পার্থক্যটা মৌলিক। এটা একটা এপিস্টেমলোজিকাল বা জ্ঞানতাত্ত্বিক পার্থক্য। এই দুই চিন্তার কাঠামো বা ফ্রেইমওয়ার্কের ভিত্তি, কেন্দ্র, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে আলাদা। শুধু আলাদা না বরং সাংঘর্ষিক। এবং ইসলামের মূল শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এ ফ্রেইমওয়ার্কথেকে যে ধারনাগুলো বের হয়ে আসে সেগুলোও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। সেটা 'মানবাধিকার', 'নারী অধিকার', 'ব্যাক্তি অধিকার' যাই হোক না কেন। তাই যদিও আপনি অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিমা ধারনাগুলোর সাথে ইসলামের অনেক ধারণার বাহ্যিক এবং শাখাগত মিল পাবেন কিন্তু সার্বিকভাবে এগুলো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ইসলামে নারীর জন্য নির্ধারিত অধিকার আর পশ্চিমা ফ্রেইমওয়ার্ক থেকে বের হয়ে আসা 'নারী অধিকার' এর মধ্যে পার্থক্য আকাশ আর পাতালের।

মুসলিম হিসেবে আমরা এই ধারণাগুলো এবং আন্ডারলায়িং মতাদর্শ ও প্রাথমিক মূলনীতিগুলোকে অস্বীকার করি। ঠিক যেমন

আমরা ঐ যীশুকে অস্বীকার করি যে তিনের এক, যে 'ঈশ্বরের পুত্র', যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত পর আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে (slain & resurrected)।

কিন্তু এ প্রত্যাখ্যানের অর্থ এই না যে আমরা সাইয়্যিদিনা 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম_ -কে অস্বীকার করি, যিনি কুমারী মারইয়ামের গর্ভেজন্ম নিয়েছিলেন। যিনি আল্লাহর নবী, যার ওপর ইনযিল নাযিল হয়েছিল, যিনি উম্মী নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, যাকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইহুদীদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেছিলেন, যিনি ক্বিয়ামতের আগে দামাসকাসের শ্বেত মিনারের কাছে অবতরন করবেন, আল-মসীহ আদ-দাজ্জালকে হত্যা করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, জিযিয়া রহিত করবেন এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন স্বীকার করবেন না – তাঁর ওপর শান্তি, যেদিন তিনি জন্মেছেন এবং যেদিন তিনি মারা যাবেন আর যেদিন তাঁকে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।

একইভাবে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা নাযিল করেছেন তার কোন কিছুই অস্বীকার করি না, যেখানে যতোটুকু তিনি নির্ধারন করে দিয়েছেন আমরা ততোটুকুই স্বীকার করি। এবং আমরা মনে করি না যে ইসলামের ধারণাগুলোকে ব্যাখ্যা অথবা বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমে ফ্রেইমওয়ার্ককে ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন আছে। আমাদের বিশ্বাস এবং করণীয় কী, তা বোঝার জন্য আমাদের অন্য কারো কাছে যাবার প্রয়োজন নেই, আর পশ্চিমাদের কাছে উপাদেয় হিসেবে উপস্থাপনেরও প্রয়োজন নেই। অথবা একবার ইসলামের পরিভাষা দিয়ে পশ্চিমা দর্শনকে ইসলামাইয করে, আরেকবার পশ্চিমা পরিভাষা দিয়ে ইসলামী কাঠামোকে ব্যাখ্যা করে, নানারকম শিশুসুলভ ক্যাটাগরি এরর[6]-এর মিশেল বানিয়ে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তালগোল পাকানোর কোন প্রয়োজন আছে বলেও আমরা মনে করি না।

আমরা বিশ্বাস করি কেবল বাহ্যিক সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে এই ধারণাগুলো এবং সেগুলোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান কিংবা পদ্ধতির ইসলামীকরন সম্ভব না। সেটা ব্যাংক হোক, গণতন্ত্র হোক, কল্যান রাষ্ট্র হোক কিংবা অন্য কিছু। যতোই শাখাগত সাদৃশ্য থাকুক না কেন পশ্চিমা ধারনাগুলোর ওপর নিছক কিছু শার'ই বিধিনিষেধ বা রেস্ট্রিকশান্স দিয়ে সেগুলোকে 'ইসলামাইয' করা সম্ভব না। ইসলামের সাথে এগুলোর পার্থক্য ও সংঘর্ষ মৌলিক। যারা আসলেই বিশ্বাস করেন যে এগুলোর ইসলামীকরন সম্ভব তারা হয় পশ্চিমা এ ধারণাগুলোকে ঠিকমতো বোঝেননি অথবা ইসলামকে ঠিকমতো বোঝেননি। আর যারা পশ্চিমের ইসলামীকরনকে সাময়িক কৌশল হিসেবে গ্রহন করছেন তারা কেবল নিজেদেরকেই বোকা বানাচ্ছেন। পশ্চিমকে আপনি পশ্চিমের খেলায় হারাতে পারবেন না। সাময়িকভাবে 'ইউসফুল ইডিয়ট'[7] হিসেবে ব্যবহৃত হলেও একসময় তারা পশ্চিমের কাছেও রিজেক্টেড হবেন আর যাদেরকে তারা 'কট্টর' মুসলিম বলছেন তাঁদের কাছে তো তাদের চিন্তা প্রত্যাখ্যাতই।

* * *

[1] Answering the Question: What is Enlightenment? Kant (1784)]।

[2] Kant (1৭64)। ব্যাক্তির স্বাধীনতা ও স্বশাসনের তুলনামূলক সহজ বর্ণনার জন্য দেখুন Ethical Theory and Moral Problems, Curzer (1999)

[3] Rationality & Freedom, Sen (2000); Developement As Freedom, Sen (1999)

[4] Clark, 1877

[5] Bentham, 1789

[6] http://www.benedictbeckeld.com/philosophyblog/2015/9/16/on-the-category-error

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Useful_idiot